মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিবিদ
আবু জাফর মাহমুদকে

লেখকের কথা

স্কটিশ ইতিহাসবিদ এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস" এ উল্লেখ করেছেন, "ভারতের মুসলমানরা বহু বছর ধরে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির দীর্ঘস্থায়ী বিপদের কারণ হিসেবে ছিল।" ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পর থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেও মুসলমানদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সিপাহি বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে তাদের শাসন নির্বিঘ্ন করা বা তাদের পথের কাঁটা দূর করতে যে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তখনো ব্রিটিশের নির্মমতার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তারা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর অধিকাংশ ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী" ইতিহাস রচনা করেছেন, সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অজ্ঞাত কারণে তারা মুসলমানদের অবদানকে মুছে দিয়েছেন। বিগত সাড়ে সাত দশক যাবৎ আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস পাঠ করছি, সেখানে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত, অথবা যাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের অবদানকে প্রায় ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাড়ে সাত দশকে যারা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করেছেন এবং এখন যে প্রজন্ম বেড়ে উঠছে, তারা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস থেকে যা জানতে পারছে, তাতে তারা হয় বিশ্বাস করছে যে, মুসলমানরা ব্রিটিশপন্থি ছিল অথবা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা আদৌ অংশগ্রহণ করেনি।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ভারতে, এমনকি ভারতের বহুসংখ্যক স্যাটেলাইট টেলিভিশন টকশোতে অনেক উগ্রপন্থি আলোচক উপমহাদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও মূল্যায়নের কারণে। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্মোচন করা "ডিকশনারি অব ইন্ডিয়া'স ফ্রিডম স্ট্রাগল ১৮৫৭-১৯৪৭" অনুযায়ী স্বাধীনতা

সংগ্রামে শাহাদত বরণকারীদের ৩০ শতাংশ ছিল মুসলমান। এ ডিকশনারিতে ১৮৫৭ সালের আগের শহিদদের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে তাদের শাসন সম্প্রসারণ করেছে মুখ্যত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ইতিহাসের নামে ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তিকরণ প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং মুসলমানদের অবদানকে খাটো করে দেখানো হচ্ছে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে তা চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনালগ্ন থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল মুসলমানরাই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধে যথাক্রমে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাসিমকে পরাজিত করার পর। ওই সময় থেকে তারা যে বেপরোয়া লুণ্ঠন চালাতে শুরু করে তার পরিণতি ছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যে দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করেছিল।

বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় প্রতিরোধও শুরু হয়েছিল বাংলা থেকেই। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম ফকিররা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর প্রদেশের কানপুরের এক মুসলিম সুফি মজনু শাহ। তিনি ছিলেন কানপুরের শাহ মাদার নামে এক সুফির মুরিদ। মজনু শাহ আরেকজন সুফি হামিদুদ্দীনের পরামর্শে দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। তার অধীন প্রায় ২,০০০ সন্ন্যাসী ও ফকির ব্রিটিশ ও ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী জমিদারদের কোষাগার ও গোলা দখল করে প্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্য দরিদ্র ও শোষিত জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেয়। মজনু শাহ ১৭৬৩ থেকে ১৭৮৬ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ তাদের চোরাগুপ্তা যুদ্ধ কৌশলে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর মুসা শাহ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভবানী পাঠকের মতো হিন্দু সন্ন্যাসী নেতারা তাদের অনুসারীদের নিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি লড়াই করেছেন। ব্রিটিশ রেকর্ডে মজনু শাহকে চরম হুমকিপূর্ণ বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তার অধীনে হিন্দু ও মুসলমানরা যৌথভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছে। মজনু শাহের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হলেও জাতীয়তাবাদের চেতনাকে তারা হত্যা করতে পারেনি। বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমন করা হলেও তারা পরাজয় মেনে নেয়নি। ফকিররা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তারা মারাঠা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগ দেয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে দেশীয় সিপাহিদের প্রথম বড় ধরনের বিদ্রোহ ঘটে ১৮০৬ সালে তামিলনাড়ুর ভেলোরে, যে বিদ্রোহকে ১৮৫৭ সালে দেশীয় সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের অনুপ্রেরণা বিবেচনা করা হয়। এ বিদ্রোহের

পরিকল্পনার পেছনে ছিলেন মারাঠা হোলকার নেতৃবৃন্দ, টিপু সুলতানের দুই পুত্র এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের ভাই। ফকিররাও এ বিদ্রোহে সহায়ক শক্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি সেনানিবাসে ফকিররা তাদের ধর্মীয় বক্তৃতা, গান ও পুতুলনাচের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বার্তা প্রচার করে। যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন ভেলোরের মতো কিছু স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ আদম, পীরজাদা, আবদুল্লাহ খান, নবি শাহ ও রুস্তম আলীর মতো ফকির নেতৃবৃন্দ। কেরালার গবেষক পেরুমল চিননিয়ান লিখেছেন, "দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহে সমর্থন ছিল ফকির এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর। তাদের দ্বারা এ বিদ্রোহ সকল সেনাঘাঁটিতে সংঘটিত হয়েছিল।"

কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরেকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের আকারে, যার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভি, হাজি শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর। উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে জন্মগ্রহণকারী সৈয়দ আহমদ দেশের বিরাট অংশ সফর করেন এবং বিহার, বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে তার অনুসারী সংগ্রহ করেন। তারা আফগানিস্তান সংলগ্ন এলাকায় ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। কয়েক দশক পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্রিটিশের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ রেকর্ডে এ আন্দোলনকে ধর্মীয় উগ্রবাদ দ্বারা প্রভাবিত বলা হলেও বাস্তবে সৈয়দ আহমদ বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে লড়ার উদ্দেশ্যে মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩১ সালে তিনি বালাকোটের যুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর পাটনার এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাদের বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর বেশ কিছু সংঘর্ষে কয়েকশ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে।

হাজি শরিয়তুল্লাহ এবং তার পুত্র দুদু মিয়া বাংলায় অস্ত্র হাতে নেন ব্রিটিশের সমর্থনপুষ্ট জমিদারদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। তারা ব্রিটিশ নীল ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্রিটিশ এজেন্টদের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। ইতিহাসে এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে খ্যাত। তিতুমীর ব্রিটিশ সমর্থিত জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার দরিদ্র কৃষকের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি তার বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩১ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালে তিনি নিহত হন। তার প্রধান সহকারী গোলাম রসুলসহ শত শত অনুসারীকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভি যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, তা ব্রিটিশ শাসনের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছিল। তার মৃত্যুর পর এ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন তার অনুসারী এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, কারামত আলী জইনউদ্দীন, ফরহাত হুসাইনসহ আরও অনেকে। তারা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একটির পর আরেকটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীকে দিশাহারা অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মিরাট ও দিল্লিতে দেশীয় সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর বিহারের পাটনায় পৌঁছার পর সেখানকার নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহে ভূমিকা পালন করতে

পারেন আঁচ করে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। তা সত্ত্বেও পাটনার এক পুস্তক বিক্রেতা পীর আলী খান বিদ্রোহ করেন। এটি যদিও সিপাহি বিদ্রোহের অংশ ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, বিদ্রোহের সঙ্গে পীর আলীর সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৫৭ সালের ৩ জুলাই তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে সফল বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পরদিন তাকে ও তার সঙ্গী এবং সমর্থকদের গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

১৮৫৭ সালে সংঘটিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনার পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮৩৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার হায়দ্রাবাদের নিজামের ভাই মুবারিজউদ্দৌলা নামে এক মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করে তিনি বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন সন্দেহে। তিনি ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তার সঙ্গে পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংসহ উত্তর ও মধ্য ভারতের বহু রাজা ও নবাব সম্মত ছিলেন। তিনি তাদের মিলিত শক্তির পক্ষে সমর্থন ও সহায়তা পাওয়ার জন্য পারস্য ও ফরাসি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন বলে ব্রিটিশ তদন্তে প্রকাশ পায়। কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের কারণে এ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। মুবারিজউদ্দৌলা ১৮৫৪ সালে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৪৫ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশের জানাজানি হয়ে যায়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, সিন্ধিয়া ও নেপাল নরেশেসহ বেশ কয়েকজন রাজন্যের সহায়তায় খাজা হাসান আলী খান, মালিক খাদেম আলী, সাইফ আলী ও কুনওয়ার সিং একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আবারও কয়েক ভারতীয়, যারা বিদেশি শাসকের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছিল, তাদের চক্রান্তে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে উৎখাতের বড় ধরনের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, যা যথার্থই ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল, এই যুদ্ধে মুসলমানদের ভূমিকা ধামাচাপা দেওয়ার উপায় নেই। এই যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সে ঐক্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এর আগে ব্রিটিশরা আর কখনো এত বড় হুমকির মোকাবিলা করেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ শক্তি তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে হিংসা-বিদ্বেষমূলক মনোভাব টিকিয়ে রাখতে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার নীতি গ্রহণ করে। ফৈজাবাদের আহমদুল্লাহ শাহ, ফজলে হক খয়রাবাদী, মুজাফফরনগরের ইমদাদউল্লাহ মুহাজির মক্কী, নানা সাহেবের সহযোগী আজিমুল্লাহ খানের মতো নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আবশ্যকতার ওপর জোর প্রচারণা চালান। ১৮৫৭ সালের অনেক আগে থেকেই তারা ব্রিটিশ বাহিনীর দেশীয় সিপাহি এবং বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে তারা এই প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন।

১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে দেশীয় সিপাহিরা তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের নেতা ছিলেন শেখ পীর আলী, আমির কুদরত আলী, শেখ হাসান-উদ-দীন ও শেখ নূর মুহাম্মদ। প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ৮৫ জন দেশীয় সিপাহি, যারা নতুন চালু করা এনফিল্ড রাইফেলে গরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত কথিত কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করায় যাদের শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের অর্ধেকের বেশি ছিল মুসলিম। শিগ্‌গিরই সিপাহিদের সঙ্গে বেসামরিক লোকজন যোগ দেয় এবং বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লি গিয়ে শেষ মোগল সম্রাট বয়োবৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে। তারা দিল্লিকে ব্রিটিশ মুক্ত করে। লক্ষ্ণৌ এ বেগম হজরত মহল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং বিদ্রোহ চলাকালে দীর্ঘতম সময় ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। মৌলবি আহমদুল্লাহ তার বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করেন। তার বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদগণ, এমনকি ভারতে উগ্র হিন্দু সংগঠন 'আরএসএস' এর প্রতিষ্ঠাতা বীর সাভারকর পর্যন্ত তার গ্রন্থে আমদউল্লাহ শাহের সাহস ও শাহাদতের ওপর বেশ কয়েক পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেছেন।

ওই সময়ের জনপ্রিয় মুসলিম নেতা কাসিম নানাতুবি রশীদ গাঙ্গোহি'র সহায়তায় ইমাদউল্লাহ উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরে জনপ্রিয় বিদ্রোহ ঘটিয়ে থানা ভাওয়ানের শামলি মুক্ত করেন। সেখানে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হন। দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধ করার কারণে ঝাজ্জারের নবাব আবদুর রহমানকে ফাঁসিকে ঝোলানো হয়। সিপাহি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় মুসলিম শহিদের তালিকা বিস্তৃত। এমনকি অনেক মুসলিম নারীও বিদ্রোহে অংশ নেয়। বিহারে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন কুনওয়ার সিং, যার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহকারীরা ছিলেন মুসলিম, যাদের সঙ্গে তিনি প্রতিটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন। আরাহ এলাকাকে ব্রিটিশ মুক্ত করার পর তিনি সেখানে যে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, সে সরকারে অনেক মুসলিম নেতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদের মধ্যে শেখ গোলাম ইয়াহিয়া ছিলেন বিচারক, শেখ মুহাম্মদ আজিমউদ্দিন ছিলেন খাজাঞ্চি, দিওয়ান শেখ আফজালের দুই পুত্র তোরাব আলী ও খাদিম আলীকে নিয়োগ করা হয়েছিল শহর কোতোয়াল বা দারোগা।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হয়নি। ব্রিটিশ সরকার দিল্লি এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমনের পর শেষ মোগল সম্রাটকে বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্ব দানকারী সাব্যস্ত করে এবং তড়িঘড়ি বিচার করে বর্তমান মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত করে। মোগল রাজবংশের প্রায় সকল জীবিত পুরুষ সদস্যদের গুলি করে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বহু সংখ্যককে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয় থেকে স্বাধীনতার চেতনা মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

১৮৬৩ সালে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিরা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হামলা চালিয়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক বিজয়লাভ করে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের ওপর সামরিক চাপ বজায় রাখে। এসময় উপজাতি মুসলিমদের হাতে একহাজারের অধিক ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছিল। উপজাতি বিদ্রোহের পেছনে তারা আম্বালার জাফর থানেশ্বরীর ভূমিকা আবিষ্কার করে এবং তাকে গ্রেফতার করে আন্দামানে প্রেরণ করে। পাটনার ইয়াহিয়া আলী এবং আরও নয়জনকে ইংল্যান্ডের রানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এভাবে সমগ্র ভারতজুড়ে গ্রেফতার ও বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৮৬৯ সালে আমির খান ও হাশমত খানকে কলকাতায় গ্রেফতার করার পর ১৮৭১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জন প্যাক্সটন নরম্যান তাদেরকে যাবজ্জীবন আন্দামানে নির্বাসিত জীবন কাটানোর জন্য প্রেরণের রায় প্রদান করলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নামে এক পাঞ্জাবি মুসলিম প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এর কয়েক মাস পর আন্দামানে নির্বাসিত এক তরুণ পাঠান মুসলিম বন্দি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।

বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র পাল তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এসব বিচার ও হত্যাকাণ্ড তার রাজনৈতিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অপর এক খ্যাতিমান বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যিনি ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত আন্দামানের সেলুলার দ্বীপে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন, তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের কাহিনি "জেলে ত্রিশ বছর : ব্রিটিশ-পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মুসলিম বিপ্লবী ভাইয়েরা আমাদের অবিচল সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।"

মহারাষ্ট্রে রোহিলা নেতা ইব্রাহিম খান ও বলওয়ান্ত ফাদকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন, যা ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হুমকি হিসেবে ছিল। এদিকে বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনা ও তাদের তথা ভারতের সমস্যা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রথম দিকের দুজন মুসলিম সদস্য ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন বদরুদ্দীন তাইয়েবজি (১৮৮৭), রহমতুল্লাহ এম সায়ানি (১৮৯৬)। পরবর্তীতে আরও অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা ছিলেন : নবাব সাইয়িদ মুহাম্মদ বাহাদুর (১৯১৩), সাইয়িদ হাসান ইমাম (১৯১৮), হাকিম আজমল খান (১৯২১), মোহাম্মদ আলী জওহর (১৯২৩), এম এ আনসারি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯২৩ এবং ১৯৪০-৪৬), মুখতার আহমেদ আনসারি (১৯২৭)। এছাড়া ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্যায়ে আরও অনেক মুসলিম জড়িত থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা রেশমি কাপড়ের ওপর হাতে লেখা তিনটি চিঠি আটক করে। মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি চিঠিগুলো লিখেছিলেন মওলানা মাহমুদ হাসানকে। চিঠিগুলোতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বৈশ্বিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের রাওলাট কমিটি রিপোর্টে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে ব্রিটিশের জন্য অন্যতম বিপজ্জনক ভারতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করেছিলেন, জনগণের মাঝে ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রচারণা চালিয়েছেন, এমনকি তিনি কাবুলে ভারতীয়দের একটি প্রবাসী সরকার পর্যন্ত গঠন করেছিলেন। এই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল মওলানা বরকতউল্লাহকে। প্রবাসী সরকার একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেছিল, যে বাহিনী ভারতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু রেশমি চিঠির রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ পরিকল্পনা 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' নামে খ্যাত। এ আন্দোলনে জড়িত ৫৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অভিযুক্ত করা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য। অভিযুক্তদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আবদুল বারী ফিরাঙ্গি মাহলি, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, মওলানা মাহমুদ এবং মওলানা মাদানিসহ অভিযুক্তদের অনেককে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে মাল্টায় আটকে রাখা হয়।

'হিজবুল্লাহ' নামে এক বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১,৭০০ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগের শপথ নিয়েছিলেন। মওলানা আবুল কালাম সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আল-হিলাল' নামে একটি সংবাদপত্রকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা প্রচারের অভিযোগে। উপনিবেশ বিরোধী ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে মওলানা আজাদ 'দারুল ইরশাদ' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসময় জালালউদ্দীন ও আবদুর রাজ্জাক স্বাধীনতা যোদ্ধা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা আজাদ ভারতের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে অনেকবার কারাবরণ করেছেন এবং তিনি যখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ১৯৪২ সালে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' ব্রিটিশ বিরোধী একমাত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল না। 'গদর আন্দোলন' অনুরূপ আরেকটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে আন্দোলনে বহু মুসলিম অংশগ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশের জুলুম নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে রহমত আলীকে লাহোরে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এ আন্দোলন সিঙ্গাপুরে বেশ সাফল্য লাভ করেছিল, যখন ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিফথ লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সিপাহিরা বিদ্রোহ করে, যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি মুসলিম। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী

অধিকাংশ সিপাহিকে সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার করার পর সংক্ষিপ্ত বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, বাংলায় 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' নামে দুটি বিপ্লবী সংগঠনের সকলেই হিন্দু ছিল এবং তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল হিন্দু চেতনাদ্বারা উদ্বুদ্ধ। বিস্তু এ দুটি সংগঠনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম ছিলেন, যাদের মধ্যে সিরাজুল হক, হামিদুল হক, আবদুল মোমিন, মাকসুদউদ্দীন আহমেদ, মৌলবি গিয়াসউদ্দীন, নাসিরউদ্দীন, রাজিয়া খাতুন, আবদুল কাদের, ওয়ালি নেওয়াজ, ইসমাইল, চান্দ মিয়া, আলতাফ আলী, আলিমউদ্দীন, ফজলুল কাদের চৌধুরীর নাম জানা যায়। তারা হিন্দুদের পাশাপাশি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তাদের অনেককে গ্রেফতারের পর আন্দামানে নির্বাসিত অথবা হত্যা করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীদের ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'রাওলাট অ্যাক্ট' নামে এক কালো আইনের প্রয়োগ শুরু করে। এ আইনে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বিনা কারণে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার। এছাড়া ব্রিটিশ ভারতে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি সন্ত্রাসে জড়িত বলে সন্দেহ হলে তাকে বিনা বিচারে আটক রাখার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল এ আইনে। ভারতীয়রা এই দানবীয় আইনের প্রতিবাদে সোচ্চার হলে বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সাইফুদ্দীন কিসলু নামে এক নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনতা ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হলে ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের নির্দেশে সমাবেশের ওপর নির্বিচারে গুলি ছোড়া হয়। এতে ১,২০০ এর অধিক নিরীহ লোক নিহত এবং প্রায় দুশো জন গুরুতর আহত হয়। হতাহতদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

এর কাছাকাছি সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী জননেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আবদুল বারী ফিরাঙ্গি মাহলি, মাজহারুল হক, জাকির হুসাইন, মোহাম্মদ আলী জওহর ও শওকত আলী। বি আম্মা, আমজাদি বেগম ও নিশাত-উন-নিসা'র মতো নারীরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ১৯৩০ এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন আবদুর রহিম নামে এক নেতা। ভি এম আবদুল্লাহ, শরীফ ভ্রাতৃদ্বয় ও আবদুস সাত্তার দাক্ষিণাত্যে প্রভাবশালী মুসলিম নেতা হিসেবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন এবং তারা ব্রিটিশের নিপীড়ন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন।

খান আবদুল গাফফার খানের নেতৃত্বে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনড় অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যা ব্রিটিশ শক্তির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩০ সালের ২৩ এপ্রিল পেশোয়ারের কিসসা খানি বাজারে গাফফার খানের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হলে বিক্ষোভ দমনে ব্রিটিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। প্রায় চারশ পাঠান মাতৃভূমির জন্য জীবন দান করে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে

ইপি'র ফকির মির্জা আলী খান ও পাগারো'র পীর সিবগাতুল্লাহ ওয়াজিরিস্তান ও সিন্ধে সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে এই বাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল নেতাজি সুভাষ বোস এবং অক্ষশক্তির।

১৯৪১ সালে নেতাজি সুভাষ বোস গৃহবন্দি থাকা অবস্থায় ব্রিটিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হন। তার পলায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মিয়া আকবর শাহ। নেতাজি বার্লিনে পৌঁছে 'ফ্রি ইন্ডিয়া লিজিয়ন' গঠন করেন। আবিদ হাসান তার আস্থাভাজনে পরিণত হন এবং তার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যখন সাবমেরিনযোগে জার্মানি থেকে জাপানে আসেন, এই দুঃসাহসিক অভিযানে আবিদ হাসানই তার একমাত্র সফরসঙ্গী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে নেতাজি সুভাষ বোস গঠন করেন 'আজাদ হিন্দ সরকার' ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজ', যা আইএনএ বা 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' নামে বহুল পরিচিত। সেই সরকার ও আইএনএ'তে লে. কর্নেল আজিজ আহমেদ, লে. কর্নেল এম কে কায়ানি, লে. কর্নেল এহসান কাদির, লে. কর্নেল শাহ নওয়াজ খান, করিম গণি, ডি এম খানসহ বহু সংখ্যক মুসলিম সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। লে. কর্নেল শাহ নওয়াজ খানকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান করা হয়েছিল, যার অধীনে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বার্মা ফ্রন্ট ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে লড়াই করেছে।

জাপানি বাহিনী বার্মা ত্যাগ করলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। দিল্লির লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন শীর্ষ অফিসার শাহ নওয়াজ খান, ধীলন ও সেগালের বিচার শুরু হলে তাদের মুক্তির দাবিতে সমগ্র ভারতে যে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ শক্তিকে নতিস্বীকার করতে হয়। বন্দি অফিসাররা বীরের বেশে ব্রিটিশের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবাসীকে এ স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে জীবন দিয়ে। যারা জীবন দিয়েছেন, তারা হিন্দু বা মুসলিম ছিলেন না, তারা ছিল ভারতীয়। দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গকারীরা প্রথমে ভারতীয়, এরপর তারা হিন্দু অথবা মুসলিম বা অন্য কোনো বিশ্বাসের মানুষ। তারা সাম্প্রদায়িকতা ও বিভাজনের চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ভ্রাতৃত্বের চেতনায়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, স্বাধীনতার পর সাড়ে সাত দশক পেরিয়ে গেলেও কোনো কোনো গোষ্ঠী ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বিস্মৃত হতে বাধ্য করছে এবং ইতিহাস রচনা করছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

ভারত থেকে বিদেশি শাসনের অবসানের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ও পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে সংঘটিত এসব সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল শাসনকারী

মুসলিম শাসক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের অনেকের অবদান ও জীবনের ওপর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনেকে আত্মজীবনীও লিখে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। সেজন্য এ গ্রন্থে তাদের অধিকাংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যাদের অবদান সম্পর্কে উপমহাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক সচেতন জনগোষ্ঠীও বিস্মৃত হয়েছেন, যাদের সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম তেমন অবহিত নয়, অথবা যাদের নামও তারা শোনেননি, এ গ্রন্থে তাদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ দখলদারদের বিদায় করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে কামানের মুখে অথবা ফাঁসিতে জীবন দিয়েছেন, দ্বীপান্তরিত হয়েছেন, যাবজ্জীবন কারাভোগ করেছেন, নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছেন এবং সহায়সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এর বাইরেও জানা ও অজানা আরও অনেক মুসলিম নেতা ও যোদ্ধা আছেন, তাদের অবদানও স্বীকৃতির দাবি রাখে এবং তাদের সম্পর্কেও আমাদের জানা প্রয়োজন। উপমহাদেশের ইতিহাস নিয়ে যারা নিবিড় কাজ করেন, আশা করি তারা এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া মুসলিম বীরদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন।

বইটির নাম 'মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা' নির্বাচন করার জন্য আমি ভারতের পরলোকগত সাংবাদিক-সাহিত্যিক খুশবন্ত সিং-এর কাছে ঋণী। এটি তার 'ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ইজ রিটেন ইন মুসলিম ব্লাড' বাংলা অনুবাদমাত্র। তার নিবন্ধটির গুরুত্বের কারণে সেটি এবং তার 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইন্ডিয়ানস : অ্যা বুক অব প্রোফাইলস" গ্রন্থ থেকে মওলানা আবুল কালাম আজাদের ওপর লেখাটিও অনুবাদ করে এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি। উপমহাদেশের আটজন খ্যাতিমান মুসলিম ব্যক্তিত্বের ওপর রাজমোহন গান্ধীর লেখা 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মুসলিম মাইন্ড' এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে একটি নিবন্ধও এখানে স্থান দিয়েছি। পাঠকরা বইটি গ্রহণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, নভেম্বর ১, ২০২৩

ভূ মি কা

যেন শেকড় ভুলে না যাই

সাধারণভাবে ভারতের এবং ব্যাপকভাবে উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসবিদরা প্রায়ই যেভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন তাতে মনে হয় যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত মুসলিম নেতাদের মধ্যে ভারত বিভাজনের আন্দোলন একটি সাধারণ প্রবণতা ছিল। একথা বলার চেষ্টা করা হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা শুরু থেকেই বিরোধিতা করেছে এবং ইসলাম কখনো একজন প্রকৃত মুসলমানকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতকে তার মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিতে পারে না। এটাও অনুমান করা হয় যে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির জন্য শেষ পর্যন্ত এই প্রবণতাই দায়ী ছিল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের এই আদর্শ মুসলিম জনগণকে এত তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের যে ছাড় দিয়েছে তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা লক্ষ্য অর্জনে সফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের দাবির ফল হিসেবে লাভ করেছে একটি পৃথক দেশ।

এসবেরই পরিণতি হিসেবে এসেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে ঢালাও অপপ্রচার। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সিপাহি বিদ্রোহের বহু আগে থেকে ভারতের অনেক মুসলিম শাসক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ে শাহাদত বরণ করেছেন, ফাঁসিতে প্রাণত্যাগ করেছেন, বিনা বিচারে কারাগারে কাটিয়েছেন, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনো ভারতীয় মুসলমানদের একটি বড় অংশ দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে অখণ্ড ভারতের পক্ষে অটল ভূমিকা পালন করেছেন। এটা সত্য যে, মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ধারায় ভারতকে বিভক্ত করার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল, কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ভারতের সকল মুসলমান মুসলিম লীগের দর্শনের সঙ্গে একমত পোষণ করেনি। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ভারতেই অবস্থান করতে চেয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের রাজনীতিবিদের চেয়ে বরং একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন এবং ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজবপনের ব্রিটিশ রাজের 'বিভক্ত করে শাসন করার' নীতিকেই পুনরায় বহাল করতে চেয়েছে এবং ভারতের বর্তমান রাজনীতি সে ধারাকেই লালন করছে। সে কারণেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা গণমাধ্যম বা রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পায়নি। মুসলমানদের অবদানকে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে অথবা পণ্ডিতরা বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতাকে এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার পরিবর্তে তারা একটি সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনা করেছেন। সেজন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম বিপ্লবী, সামরিক নেতা, কবি ও লেখকদের অবদান আজ আর তেমন জানা যায় না। একইভাবে শাহজাহানপুরের মুহাম্মদ আশফাকউল্লাহ খানের অবদান সম্পর্কে ভারতবাসী এখন কমই জানে, যিনি ব্রিটিশ প্রশাসনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে তার বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ এর কাছে কাকোরিতে ট্রেনে হামলা চালিয়ে ট্রেনে বহনকারী ব্রিটিশ অর্থ লুট করেছিলেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন : "একটি ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছা অবশিষ্ট নেই যে, কেউ আমার কাফনের ওপর মাতৃভূমির সামান্য মাটি ছড়িয়ে দেবে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারত চরম নৈরাজ্যের শিকার হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও শূন্যতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের একটি স্থান করে নেয়, যা তারা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রেখেছিল। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিপদ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এবং তা যথাযথ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কোম্পানির শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে কলকাতার দিকে অগ্রসর হন এবং ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কোম্পানির শক্তিশালী ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন। কিন্তু তার অবিশ্বস্ত সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাকে প্রথমত কলকাতাকে অরক্ষিত রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতে হয় এবং ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি ও তহবিল সরবরাহকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে মহীশূরের শাসক সুলতান হায়দার আলী সহজে কোনো বিদেশি শক্তির কাছে নতিস্বীকার করেননি। হায়দার আলী ইতিহাসে যে ছাপ রেখে গেছেন তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক মহান যোদ্ধার। টিপু সুলতান বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে তার পিতার চেয়েও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এসব ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন অধিকাংশ ভারতীয় শাসক বিদেশি শাসকের জেঁকে বসার প্রচেষ্টার পরিণতি উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিলেন। টিপু সুলতান তার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ কৌশলে পাশ্চাত্যের কৌশল অবলম্বন করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রের সন্ধানে তিনি ১৭৮৫-৮৫ সালে তুরস্কে, ১৭৮৭-৮৮ সালে ফ্রান্সে, ১৭৮৬ সালে

আফগানিস্তানে তার দূত প্রেরণ করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে টিপু সুলতান ১৭৮৯ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের সমর বিজ্ঞান থেকে রণকৌশল ধার করেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে গঠিত 'আহমাদি' বাহিনী আধুনিক ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল, যা অটোমান তুর্কিদের জেনিসারির মতো ছিল।

সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে কোনো শাসকের পক্ষে একটি উন্নত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। টিপু সুলতানের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তিনি যদি ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করে তার রাজ্যকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামন্ত রাজ্যে পরিণত করতে চাইতেন, তাহলে তিনি হয়তো তার রাজ্য রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তার বাহিনীর সীমিত সামর্থ্য দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করে মাতৃভূমি রক্ষায় তার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছেন। হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন, "এই সময়ের সকল ভারতীয় শাসকদের মধ্যে হায়দার আলী ও তার পুত্র টিপু সুলতান ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তি বিকাশের সবচেয়ে আপসহীন বিরোধী। তারা অন্যদের চেয়ে আরও বেশি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ শক্তির বিকাশের অর্থ ভারতের জন্য কত বড় বিপদ। মাতৃভূমির স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং বিশেষ করে ব্রিটিশের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাবকে টিপু সুলতান যেভাবে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন তা তাকে সমসাময়িক শাসক পরিবার থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।"

ব্রিটিশরা কেবল শাসক ও রাজন্যদের প্রতিরোধের মুখে পড়েনি, তাদের বিরোধিতায় এমনকি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকিররাও অবতীর্ণ হয়েছিল। ডক্টর তারা চাঁদ তার 'দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "মুসলিম ফকিরদের আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকদের জন্য কিছুটা নিয়মিত সমস্যায় পরিণত হয়েছিল।" তাদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ, যিনি ১৭৭২ সালের প্রথম দিকে তাঁর পুত্র চেরাগ আলী শাহের সঙ্গে প্রায় দুই হাজার অনুসারী নিয়ে বাংলায় আবির্ভূত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে মজনু শাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সীমাহীন সম্ভাবনার একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং বহুবার তার হাতে জেনারেল ম্যাকেঞ্জিকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। মজনু শাহ তার সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ১৭৮৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান, যে যুদ্ধে মজনু শাহ আহত হয়ে কয়েক মাস পর মারা যান।

১৭৮৩ সালে বাংলার রংপুরে শক্তিশালী এক উত্থান ঘটেছিল। এটি সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল, যে বিদ্রোহে হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। এছাড়া ফরিদপুরের হাজি

শরিয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত ফারায়েজি আন্দোলন বাংলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ছিল, যখন তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করেন যে, ব্রিটিশের অধীনে তার মাতৃভূমি 'দার-উল-হরব' বা যুদ্ধের দেশে পরিণত হয়েছে, অতএব মাতৃভূমি রক্ষায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের উৎখাত করা মুসলমানদের জন্য 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য। তার পুত্র মৌলবি মুহাম্মদ মুসলেহউদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৫৯) পিতার চেয়ে অধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে কৌশলগত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বাংলাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে আন্দোলন জোরদার করেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, ফারায়েজি আন্দোলনে লড়াকু বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। ১৮৩১ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি মেজর স্কট, মেজর সাদারল্যান্ড ও লেফটেন্যান্ট শেকসপিয়রের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হন। তিতুমীরের পতনের পর দুদু মিয়া ১৮৪০-৪৭ সালের মধ্যে আশি হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এই বাহিনী বারাসত, জয়সুর, পাটনা, ঢাকা এবং মালদাসহ বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তিতুমীর ও দুদু মিয়ার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশের হাতে নিষ্পেষিত হাজার হাজার কৃষক নীলকর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ইতিহাসে এটি 'বারাসত বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। শান্তিময় রায় তার 'দ্য আর্মি ইন ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন চ্যালেঞ্জ : অ্যা সাগা অব ইন্ডিয়া'স স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছেন, "নিসার আলী (তিতু মিয়াঁ) ও মুহাম্মদ মুসলেহউদ্দীনের (দুদু মিয়াঁ) নেতৃত্বে যথাক্রমে বারাসাত ও ফরিদপুরের বিদ্রোহ ছিল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা সংগীতের মতো।"

মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা

খুশবন্ত সিং

ভারতের স্বাধীনতা মুসলমানদের রক্তে লিখিত। জনসংখ্যার অনুপাতের বিচারে ভারতের বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্প শতাংশ হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে উৎকীর্ণ ৯৫,৩০০ স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামের মধ্যে ৬১,৯৪৫ জনের নাম মুসলিম; অর্থাৎ ৬৫ শতাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন মুসলিম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের কোরবানির ইতিহাস উদ্দেশ্যমূলকভাবে আড়াল রাখা হয়েছে। আমরা সত্য জানতে ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারি। প্রতিটি ভারতীয়ের উচিত ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা জানা এবং আমাদের সন্তানদের সত্য শেখানো।

বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, ১৭৮০ এর দশকে ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন হায়দার আলী ও তার পুত্র টিপু সুলতান। ১৭৯০ এর দশকে যুদ্ধে ব্যবহৃত মহীশূরের রকেট ছিল লোহার চোঙে তৈরি প্রথম রকেট, যা সফলতার সঙ্গে সামরিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছিল। হায়দার আলী ও তার পুত্র ১৭৮০ ও ১৭৯০ এর দশকে ব্রিটিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রকেট ও কামান ব্যবহার করেন। প্রত্যেকে জানেন যে, ঝাঁসির রানি তার পালিত পুত্রের অনুকূলে তার রাজ্যের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন এ ইতিহাস জানেন যে, বেগম হজরত মহল স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী বীরনারী, যার অবদান অকীর্তিত রয়ে গেছে, যিনি ব্রিটিশ শাসক স্যার হেনরি লরেন্সকে গুলি করেছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন চিনহাটের চূড়ান্ত যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন? আপনারা কি জানেন যে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক ও নেতা ছিলেন মৌলবি আহমদুল্লাহ খান এবং সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের ৯০ শতাংশই ছিলেন মুসলিম? ব্রিটিশ রাজের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২৭ বছর বয়সি আশফাক উল্লাহ খানকে সর্বপ্রথম ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?

মওলানা আবুল কালাম আজাদ একজন ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতা ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে মদের দোকানের বিরুদ্ধে পিকেটিং-এ ১৯ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১০ জনই ছিলেন মুসলিম।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম জোরালেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে তার নেতৃত্বই ছিল প্রধান, যার আহ্বানে ভারতের সকল জাতিগোষ্ঠীর সিপাহি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত শেষ মোগলসম্রাটের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান। নিজ জন্মভূমিতে দাফনের জন্য দুগজ জমি না পাওয়ায় দুঃখ করে বাহাদুর শাহ জাফর যে কবিতা রচনা করেছিলেন, তার জবাবে রাজীব গান্ধী সমাধির দর্শক বইয়ে তার মন্তব্য লিখেছেন :

"দো গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্থান মে,
ফির তেরি কুরবানি সে উঠি আজাদি কি আওয়াজ,
বদনসীব তু নেহি জাফর,
জুড়া হ্যায় তেরা নাম ভারত কি শান আউর শওকত মে,
আজাদি কি পয়গাম সে।"
(যদিও তুমি ভারতে দুগজ জমি পাওনি,
তবুও তোমার আত্মত্যাগে স্বাধীনতার ধ্বনি উঠেছে,
তুমি ভাগ্যহত নও, জাফর,
ভারতের মর্যাদা ও সমৃদ্ধির সাথে,
স্বাধীনতার বাণীর সাথে জড়িয়ে আছে তোমার নাম।)

আজাদ হিন্দ ফৌজের (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-আইএনএ) জন্য এম, কে, এম আমির হামজা বহু লক্ষ রুপি দান করেছেন। তিনি আইএনএ'র পক্ষে প্রচারণায় নেতৃত্ব দান করেন। আজ তার পরিবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তামিলনাড়ু ও রামানাধাপুরমের এক ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। মেমোন আবদুল হাবিব ইউসুফ মারফানি স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে তার কোটি টাকার পুরো সম্পত্তি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে দান করেন। শাহ নওয়াজ খান ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি। পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতে আসেন ও মন্ত্রিত্ব করেন। নেতাজির প্রবাসী

সরকারের ১৯টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ৫টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা ছিলেন মুসলিম। ধনাঢ্য মুসলিম নারী মা বিভিম্মা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩০ লাখ রুপির অধিক দান করেছিলেন। আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, বিহারের নবাব— এই তিনজন মিলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। মুসলিম নারী সুরাইয়া তাইয়েবজি ভারতের বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইন তৈরি করেছেন।

মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাদের মসজিদকে ব্যবহার করেছেন। উত্তর প্রদেশের একজন ইমাম যখন মসজিদে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতা পক্ষে বক্তৃতা করছিলেন, তখন ব্রিটিশ সৈন্যরা গুলি করে সকল মুসল্লিকে হত্যা করে। মুসলমানরা আটশ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত শাসন করেছে এবং তারা ভারত থেকে কোনো কিছু নিয়ে যায়নি, যা ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসিরা করেছে।

মুসলমানরা ভারতে বসবাস করেছে, ভারত শাসন করেছে এবং ভারতে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা ভারতকে উন্নত, ঐক্যবদ্ধ ও সভ্য দেশে পরিণত করেছে শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, বিচার ও রাজনৈতিক-সরকারি কাঠামোর জ্ঞান আনয়ন করার মধ্য দিয়ে, যা এখনো ভারতে ব্যবস্থাপনার কাজে প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত হয়।

তামিলনাড়ুতে ইসমাইল সাহেব ও মারুদা নয়াগম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৭ বছর অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করেছেন। তারা ব্রিটিশদের হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা সকলেই ভি,ও,সি'র (কাপ্পালোটিয়া তামিলঝান) এর কথা জানি, যিনি ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াকু প্রথম ভারতীয় নাবিক ছিলেন। কিন্তু আমরা কয়জন ফকির মুহাম্মদ রাঠোরের কথা জানি, যিনি সেই নৌযুদ্ধে ভারতীয়দের ওই জাহাজটি দান করেছিলেন। 'ভিওসি' যখন গ্রেফতার হন, তখন তার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে মুহাম্মদ ইয়াসিন নামে এক মুসলিম ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

তিরুপ্পুর কুমারান (কোডি কাটা কুমারান) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে আরও ৭ জন গ্রেফতার হন, তাদের প্রত্যেকে ছিলেন মুসলিম- আবদুল লতিফ, আকবর আলী, মহীউদ্দিন খান, ভাবু সাহাব, আবদুল লতিফ (২) ও শেখ বাবা সাহেব।

কেউ ইচ্ছা করলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের আত্মত্যাগের ওপর হাজার হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রদায়িক চরমপন্থিদের আধিপত্য, উগ্র ধর্মান্ধ হিন্দুরা এসব সত্যকে আড়াল করে রেখেছে এবং ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে ইতিহাসকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবে ভোটকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে রাখতে বিকৃত অসত্য ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে। সেজন্য দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তারা অসৎ রাজনীতিবিদদের শিকারে পরিণত না হন এবং একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করেন।

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

সূচি

মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা ২১
ভারতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে রাজমোহন গান্ধীর উদ্বেগ ২৭
হেরে যাওয়া যুদ্ধের বিজয়ী বীর : বখত খান ৩৯
মোগল বংশের শেষ উত্তরাধিকারী মির্জা মোগলের হত্যাকাণ্ড ৫০
ব্রিটিশের কাছে হার না মানা মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ ৬০
নারীর অহংকার অযোধ্যার বিদ্রোহী বেগম হজরত মহল ৭২
উপমহাদেশের প্রথম শহিদ সাংবাদিক মুহাম্মদ বকর ৭৯
এলাহাবাদের বীর সেনানী মৌলবি লিয়াকত আলী ৮৬
ব্রিটিশের ফাঁসিতে প্রবীণ রোহিলা প্রধান খানবাহাদুর খান ৯৪
এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর অশ্রুত কাহিনি পীর আলী খান ১০১
ফৈজাবাদের বিপ্লবী নেতা মৌলবি আহমদুল্লাহ শাহ ১০৮
ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার অনন্য প্রতীক আজিমুল্লাহ খান ১১৬
'শের-এ-হায়দ্রাবাদ' তুরাবাজ খান ১২৪
কানপুরের যুদ্ধে আজিজুন বাই-এর ভূমিকা ১৩০
হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সিতে হামলার নেতা মৌলবি আলাউদ্দিন ১৩৭
চট্টগ্রামকে ত্রিশ ঘণ্টা ব্রিটিশ মুক্ত রাখেন হাবিলদার রজব আলী ১৫০
সম্মানিত যোদ্ধা সুলতানপুরের মেহেদী হাসান ১৫৫
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনন্য সামরিক প্রতিভা আমির খান পিন্ডারি ১৬২
ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝোলেন শের আলী আফ্রিদি ১৬৮
প্রকাশ্যে হত্যা করেন প্রধান বিচারপতি নরম্যানকে : মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৭৯
মৃত্যুদণ্ডের রায়ে হাসছিলেন জাফর থানেশ্বরী ১৮৬
আন্দামানের বন্দি ফজলে হক খয়রাবাদী ১৯৬
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক যুদ্ধের নায়ক মাহমুদ হাসান ২০১
আজীবন মুক্তিসংগ্রামী বরকতউল্লাহ ভোপালি ২০৭
তেজোদ্দীপ্ত নেতা মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি ২১৪
বিপ্লবী সেনানায়ক মোহাম্মদ ইকবাল শেদাই ২২০
শান্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রামী সাইফুদ্দীন কিসলু ২২৭
ব্রিটিশ বিরোধী অদম্য নারী সংগ্রামী 'বি আম্মা' ২৩৩
তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ আশফাকউল্লাহ খান ২৩৮

কিংবদন্তিতুল্য নেতা হাকিম আজমল খান ২৫১
দেশভাগের বিরুদ্ধে অটল ছিলেন মওলানা আজাদ ২৫৭
'ইনকিলাব' ধ্বনির জনক মওলানা হাসরত মোহানি ২৬৭
স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতন্ত্রের কারিগর মাগফুর আইজাজি ২৭২
খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লাহ বখশ সুমরো ২৭৯
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাণপুরুষ মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান ২৮৫
'জয় হিন্দ' স্লোগানের স্রষ্টা আবিদ হাসান সাফরানি ২৯৫
'ত্রিরঙ্গা'র চূড়ান্ত নকশা করেন সুরাইয়া তাইয়েবজি ৩০৭
কেরালার আলী মুসলিয়ার : ইমাম থেকে স্বাধীনতা যোদ্ধা ৩১৪
ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের ঘোর বিরোধী হুসাইন আহমদ মাদানি ৩২৩
গান্ধীর ডাকে পড়াশোনা ছাড়েন কেরালার আবদুর রহিমান ৩৩০

ভারতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে রাজমোহন গান্ধীর উদ্বেগ

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের কিছু সুনির্দিষ্ট দিক রয়েছে। এ প্রশ্নগুলো রাজনৈতিক রূপ লাভ করেছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবি ওঠার পর থেকে। ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বহুবার হয়েছে, বহু মানুষ এসব দাঙ্গায় হতাহত হয়েছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। ভারত সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন উঠতেই ভারতের পক্ষ থেকে দ্রুত উত্তর আসে, ভারতে মুসলমানরা হিন্দুদের সম-অধিকার, সম-স্বাধীনতা ভোগ করে। ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে ভারতের মুসলিম সৈনিকরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছে। তবুও প্রশ্নগুলোর নিষ্পত্তি হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, কারণ অনেক মুসলিম ভাবতে বাধ্য হয়েছে যে নিরপেক্ষ শক্তি ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করার পর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অবর্তমানে তারা ভারতে নিরাপদে থাকতে পারবে না।

উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমাদের মধ্যে ঘৃণার আবহ মনে হয় অতীতের সকল সময়ের অবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। সেজন্য এখন পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজনও অতীতের চেয়ে বেশি। কিন্তু মূলধারার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ সে প্রয়োজন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। সন্দেহ নেই, ইন্দোনেশিয়ার পর ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং উপমহাদেশের তিনটি দেশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মিলিত মুসলিম জনসংখ্যা ৬০ কোটির বেশি। মুসলমানদের এক পাশে সরিয়ে রেখে সাধারণভাবে ভারত এবং বিশেষভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

লেখা অথবা উপমহাদেশে মুসলমানদের আবির্ভাবের সময় থেকে পরবর্তী হাজার বছরে মুসলমানদের অবদানকে অস্বীকার করার চেষ্টা চরম উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইতিহাস দুই সম্প্রদায়ের ক্ষোভ-বিদ্বেষ ও সন্দেহকেও মুছে দিতে পারে না এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখা নির্বাচিত ইতিহাস বরং মানুষের মন্দ তাড়নাগুলোকে আরও তীব্র ও শক্তিশালী করে।

একথা সত্য যে ইতিহাসের নানা মোড়ে, নানা কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলন ঘটেছে, তারা সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করেছে। কিন্তু সমঝোতা ভাঙতেও দীর্ঘ সময় লাগেনি। অনেক সময় দেখা গেছে, একটি পক্ষ বিশাল হৃদয়ের, অন্য সময় সেই পক্ষকেই মনে হয়েছে হীনমনা ক্ষুদ্র হৃদয়ের। এই দ্বৈত সত্তার উপস্থিতির পারস্পরিক সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। উপমহাদেশ জুড়ে এই প্রবণতা বিদ্যমান। হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের নিষ্পত্তি অনেকে অনেকভাবে করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনোটাই স্থায়ী হয়নি। কারণ যারা এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি চেয়েছেন, তাদের বিপরীতেও সবসময় একটি প্রবল ধারা এই নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমানদের সক্রিয় প্রভাবের উপস্থিতি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে ও পরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছিল। অনেক ইতিহাসবিদ এর মাঝে 'সাম্প্রদায়িকতা'র স্পর্শ আবিষ্কার করেছেন, অনেকে তাদেরকে 'জাতীয়তাবাদী' মুসলিম ভেবেছেন। সবকিছু সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়নি।

মহাত্মা গান্ধীর নাতি রাজমোহন গান্ধী তার 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মুসলিম মাইন্ড' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের বছরে তার বয়স ছিল বারো বছর। তিনি দিল্লিতে ছিলেন। ওই সময় ক্ষমতার পালাবদলের চেয়ে তার কাছে অনেক হিন্দু, মুসলিম ও শিখের অমানবিকতা দেখে তার মনে হয়েছিল যে তারা সময়টিকে স্বাধীনতা অর্জনের বছর নয়, লজ্জার বছরে পরিণত করেছে। তারা হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, সম্পত্তি দখলের মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল। দিল্লিতে মুসলিমরা ছিল সব নারকীয়তার নিরীহ শিকার। আকাশে তখন ধোঁয়ার যে কুণ্ডলী উঠছিল, সেগুলো ছিল দিল্লির বিভিন্ন মুসলমানদের বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা ভস্মীভূত করার। সময়ে সময়ে বাতাস চিরে গুলির যে শব্দ ভেসে আসছিল, সে শব্দ ছিল গুলি করে মুসলমানদের হত্যার। তার ১৯৪৪-৪৬ সালের কথা স্মরণে আছে যখন তিনি তার বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি 'বিরাট বাধা' নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন। এ বাধা ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যিনি পাকিস্তান দেওয়া না হলে সকলের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার